

বই পড়ার অভ্যাস কি হারিয়ে যাবে?

স মাজ প্র গ তি

এ এস এম রিয়াদ আরিফ

একটা সময় ছিল যখন তরুণদের অনেকেই অবসর কাটত বই পড়ে। নতুন বইয়ের ভাঁজ খুলে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টে পড়ার মধ্যে তাঁরা অন্য রকম এক আনন্দ পেতেন। নব্বইয়ের দশকে জন্ম নেওয়া কিশোরদের মধ্যে কাজী আনোয়ার হোসেনের গোয়েন্দা সিরিজ মাসুদ রানা কিংবা মুহম্মদ জাফর ইকবালের বইগুলো অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। এই শতকের প্রথম দশকের শুরুতেও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সবুজ ঘাসে কিংবা চায়ের দোকানে তরুণদের সাহিত্য আড্ডা বসত। সেসব আড্ডায় গল্প হতো শির, সাহিত্য, রাষ্ট্র, সমাজ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে। ক্রমে সে ধরনের আড্ডায় ভাটা পড়েছে। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে; ইন্টারনেটের সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলো হয়ে উঠেছে খুব জনপ্রিয়। বই পড়া কমেছে, কমেছে বইয়ের উপযোগিতা। বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক যন্ত্র এখন শিক্ষিত তরুণ সমাজের দিনরাত্রির সঙ্গী। মননশীলতা চর্চার অভাবে সুকুমার বৃত্তিগুলো যেন হারিয়ে যেতে বসেছে।

এখন বাংলাদেশে উগ্রপন্থা একটা গুরুতর সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। উগ্রপন্থীদের সহিংস কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের অধিকাংশই তরুণ। গুলশানের হলি আর্টিজানে হামলা থেকে শুরু করে অতিসম্প্রতি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরের মন্দির ভাঙার ঘটনায়ও তা দেখা গেছে। কিন্তু তারুণ্য তো সৃজনশীলতার বয়স, ভালো কাজে অংশগ্রহণের বয়স, সুন্দর জীবন ও জগতের স্বপ্ন দেখার বয়স। সব ধরনের অন্যায-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর বয়স। এ দেশের ইতিহাসে সব গণমুখী আন্দোলন-সংগ্রামের মূল প্রাণশক্তিই ছিল তরুণ সমাজ। সেই তরুণ সমাজের একটা অংশের উগ্রপন্থা ও সহিংসতার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া অবশ্যই একটা বড় উদ্বেগের বিষয়। খেলাধুলা, সংগীত, নাটক, চলচ্চিত্র ও শিল্প-সাহিত্যের চর্চার মধ্য দিয়ে যে সৃষ্টি মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটে, এখন সেই ক্ষেত্রে বিরাট ঘাটতি দেখা দিয়েছে। মুক্তবুদ্ধির চর্চার অভাবে পশ্চাত্তমুখী সংকীর্ণ মানসিকতা সৃষ্টি হয়; ধর্মাত্মতা ও সাম্প্রদায়িক হিংসা-বিদ্বেষ স্থান করে নেয়। বৈচিত্র্যপূর্ণ চিন্তা ও ভিন্ন ভিন্ন মত ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সহনশীল মানসিকতা হারিয়ে যায়। তখন এর সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করে উগ্র মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো। তারা তরুণ সমাজকে বিপথে চালিত করার সুযোগ পেয়ে যায়।

ব্যক্তিগত বিকাশের গুরুত্ব পর্ব হলো শৈশব। এটাই মানুষের প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠার প্রথম ধাপ। কিছুকাল

আগেও এ দেশের গ্রামে ও শহরে শৈশব ছিল মোটের ওপর আনন্দদায়ক। গ্রামের ছেলেমেয়েদের সুযোগ ছিল প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে খেলাধুলাসহ নানা ধরনের আনন্দ-বিনোদনের মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠার। বিস্তীর্ণ মাঠে নানা ধরনের খেলাধুলা, নদী কিংবা দিঘি-পুকুরে সাঁতার কাটা, ঘুড়ি ওড়ানো, মেঠোপথ ধরে বিদ্যালয়ে যাওয়া—এসবই দৈনিক ও মানসিক সুস্থত্বের জন্য অত্যন্ত উপকারী। এ দেশের গ্রামের ছেলেমেয়েদের শৈশব এভাবেই কেটে যেত। যৌথ পরিবার প্রথায় সবার আদর-ভালোবাসা বরাদ্দ ছিল তাদের জন্য। রাতে দাদা-দাদির মুখে রূপকথার গল্প শুনতে শুনতে তারা হারিয়ে যেত স্বপ্নের দেশে।

বড় শহর ও ছোট ছোট মফস্বল শহরেও শৈশব ছিল অনেক আনন্দময়। বিদ্যালয়গুলোতে ছিল বড় বড় মাঠ, মাঠের পাশে থাকত পুকুর। মাঠে খেলাধুলা আর পুকুরে সাঁতার কাটার সুযোগ ছিল অবাধ। পাড়া-মহল্লাগুলোতে মাঠ ও পুকুর ছিল। তা ছাড়া ছিল নানা ধরনের ক্লাব ও সংগঠন। ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, ভলিবল, হাড্ডু ইত্যাদি খেলাধুলা হতো। হতো নাটক ও গানবাজনার অনুষ্ঠান। পাড়ায়, পাড়ায় পাঠাগার ছিল।

কিন্তু আজ এর সবকিছুই সংকুচিত হয়ে এসেছে। মাঠ-পুকুরগুলো ক্রান্ত ভরাট হয়ে যাচ্ছে। খেলাধুলা, নাটক, গানবাজনার অনুষ্ঠান আর আগের মতো হয় না। আগের মতো ক্লাব ও শিশু-কিশোর সংগঠনও নেই। এখন ব্যাগভর্তি বইখাতা নিয়ে বিদ্যালয়ে ছুটে যাওয়া; বিদ্যালয় থেকে ফিরেও 'কোচিং' করতে এক শিক্ষকের কাছ থেকে অন্য শিক্ষকের কাছে ছোট্ট এভাবে ছেলেমেয়েদের শৈশব পার হয়ে যাচ্ছে। শৈশব-কৈশোরের প্রায় সব আনন্দই যেন হারিয়ে যেতে বসেছে।

তারুণ্যের আলোয়

একটি সহনশীল ও মানবিক সমাজ গঠনে বই পড়ার বিকল্প নেই। এ জন্য পাড়ায়-মহল্লায় পাঠাগার ও পাঠচক্র গড়ে তোলার আন্দোলন শুরু করা দরকার। ই-বুকও অবশ্যই এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে

এভাবে যারা তরুণ বয়সে পা রাখছে, তাদের মানসিক বিকাশ যথেষ্ট নয়। তারা ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদি সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমের সর্বগ্রাসী প্রভাবের মধ্যে বই পড়ার সংস্কৃতি দূরে সরে যাচ্ছে। পাঠাগারগুলোতে এখন হতাশাব্যঞ্জক শূন্যতা। বইয়ের দোকানও কমে যাচ্ছে। ঢাকার আজিজ সুপার মার্কেটে একসময় অনেক বইয়ের দোকান ছিল। এখন আছে হাতে গোনা কয়েকটা। কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেটেও বইয়ের দোকানের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে।

বই মানুষকে যুক্তিবুদ্ধি জোগায়, তাকে চিন্তাশীল করে; তার ভেতরের সম্ভাবনাগুলো জাগিয়ে তোলে। কিন্তু পাঠাভ্যাস কমে যাওয়ার ফলে একটি সৃজনশীল ও মননশীল জাতি হিসেবে আমরা প্রত্যাশিত মাত্রায় বিকশিত হতে পারছি না। পরিপূর্ণভাবে বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন জ্ঞানের অবাধ ও উন্মুক্ত চর্চা। সভ্যতা ও মূল্যবোধের বিকাশ ঘটানোর জন্য বই পড়ার বিকল্প নেই।

ডিজিটাল যোগাযোগ প্রযুক্তির ফলে তথ্য ও জ্ঞান বিস্তারের অভূতপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর অনেক দেশে ছাপা বইয়ের বিকল্প হিসেবে ইলেকট্রনিক বুক বা ই-বুকের প্রচলন বাড়ছে। কিন্তু যে জাতির বই পড়ার অভ্যাস কম, কিংবা যাদের মধ্যে বই পড়ার যেটুকু অভ্যাস ছিল তাও হারিয়ে যাচ্ছে, তাদের মধ্যে ই-বুক পড়ার প্রবণতাও খুব বাড়ার কথা নয়।

কিন্তু একটি সহনশীল ও মানবিক সমাজ গঠনে বই পড়ার বিকল্প নেই। এ জন্য পাড়ায়-মহল্লায় পাঠাগার ও পাঠচক্র গড়ে তোলার আন্দোলন শুরু করা দরকার। ই-বুকও অবশ্যই এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এখন মোবাইল ফোনেও ই-বুক পড়া ও আদান-প্রদান করা যায় খুব সহজেই। বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন সম্মিলিত উদ্যোগ। লেখকেরা মননশীল ও বৈচিত্র্যময় লেখার মাধ্যমে তরুণদের আকৃষ্ট করবেন। প্রকাশনা সংস্থাগুলোর উচিত সহনশীল মূল্যে সে বই বিক্রির উদ্যোগ নেওয়া। অভিভাবকেরা বই পড়ার বিষয়ে উৎসাহিত করবেন সন্তানদের। এভাবে বই পড়াকে সামগ্রিক একটি সামাজিক আন্দোলনের রূপ দিতে হবে। পাঠক বইয়ের কাছে না গেলেও বইকে নিয়ে যেতে হবে পাঠকের নাপালের মধ্যে। স্টেশন, বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু করে বড় বড় বিপণিবিতানের মতো জনমানুষের প্রধান প্রধান বিচরণের জায়গাগুলোতে গড়ে তুলতে হবে বইয়ের দোকান কিংবা পাঠাগার।

এ ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা মোটেও কম নয়। বড় শপিং কমপ্লেক্সগুলোতে কয়েকটি বইয়ের দোকানের শর্ত জুড়ে দেওয়া যেতে পারে। এমনকি ছোট ছোট চায়ের দোকানকে কেন্দ্র করেও পাঠাগার ও পাঠচক্র গড়ে তোলা যেতে পারে। স্কুল-কলেজগুলোতে সরকারি উদ্যোগে বইপড়া কর্মসূচি শুরু করা যেতে পারে।

● এ এস এম রিয়াদ আরিফ : নয়াদিঘির সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, নয়াদিঘিতে সমাজবিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষারত।
riad.arif@students.sau.ac.in